BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD

SYNOPSIS FOR PHD RESEARCH WORK

TITLE

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা : জীবন সময় ও সমকাল

(MANINDRA GUPTER KABITA : JIBON SOMOY O SOMOKAL)

RESEARCH SCHOLAR

PANCHANAN NASKAR

VILL- DAKSHIN KHATSARA, P.O.- DAKSHIN BARASAT,

DIST- 24PGS (S), WEST BENGAL, PIN- 743372

SUPERVISOR

DR. MANAS ACHARYYA

ASST. PROFESSOR, B.B.M.K. UNIVERSITY, DHANBAD

TITLE

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা : জীবন সময় ও সমকাল

(MANINDRA GUPTER KABITA : JIBON SOMOY O SOMOKAL)

_____________________________   __________________________________

Signature with date of supervisor   Signature with date of Research Scholar

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (SUMMARY OF RESEARCH WORK)

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (RESEARCH METHODOLOGY)

RESEARCH METHODOLOGY: ANALYTICAL AND DESCRIPTIVE RESEARCH

1. DATA COLLECTION AND ANALYSIS
2. COLLECTION FROM LIBRARY
3. PURCHASED BOOK.
4. INTERVIEW WITH CONTEMPORARY POETS.
5. USE OF INTERNET THROUGH COMPUTER / SMART PHONE, M.S WORD PAD, TAPE RECODER, STILL CAMERA.

গবেষণার বিষয় (OBJECTIVE OF RESEARCH): মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা : জীবন সময় ও সমকাল (MANNINDRA GUPTER KABITA : JIBAN SAMAY O SAMAKAL)

অনুমান(HYPOTHESIS):

পাঁচের দশকের রণরক্তময় সময় পর্বে মানুষ যখন নিজস্ব কবিতার Text, Diction ও Discourse নির্মাণে তৎপর তখন এই দশকের কবি মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায় আদি মানব তথা আদি জীবসৃষ্টির কালের মনুষ্যজীবনকে বহমান জীবনস্রোতে ফেলে বাংলা কবিতায় এক নতুন আদি মনোবীজের সন্ধান দিলেন।

তাৎপর্য(SIGNIFICANCE): মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় জল, সমুদ্র, আগুন, গুহা, বন, ফড়িং-এ সবের সঙ্গে নিজের শরীরগত রক্ত-লসিকা ও মানসগত ভাব সাদৃশ্যের সন্ধান করে তিনি কবিতার যে মায়াভূমি রচনা করেছেন তাতে একদিকে আদিম পৃথিবীর সৃষ্ট জীবজগতের সঙ্গে নিরন্তর ঘটে যাওয়া বহমান জীবনের সাদৃশ্য সন্ধানের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা কবিতার নতুন ভূমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রচেষ্টা সর্বার্থেই মনুষ্য জীবনের মূল্যবোধ ও বোধিকে নিঃসন্দেহে প্রসারিত করে।

ভূমিকা(INTRODUCTION):

প্রথম অধ্যায়(FIRST CHAPTER): কবির ব্যক্তিজীবনের নানা অনুসঙ্গ (KABIR BYAKTI JIBONER NANA ONUSANGO)

দ্বিতীয় অধ্যায়(SECOND CHAPTER): পরমা ও কবি-চিত্রকর (PARAMA O KABI-CHITRAKAR)

তৃতীয় অধ্যায়(THIRD CHAPTER): কবিতায় সমকালীন সমাজ ও জীবন (KABITAY SAMAKALIN SAMAJ O JIBAN)

চতুর্থ অধ্যায়(FOURTH CHAPTER): পঞ্চাশের কবিসমাজ ও মণীন্দ্র গুপ্ত (PANCHASER KABISAMAJ O MANINDRA GUPTA)

পঞ্চম অধ্যায়(FIFTH CHAPTER): কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্তের অনন্যতা (KABITAY MANINDRA GUPTER ANANNATA)

ষষ্ঠ অধ্যায়(SIXTH CHAPTER): কবিতায় মিথ ও আর্কেটাইপের ব্যবহার (KABITAY MYTH O ARCHETYPE-ER BYABOHER)

উপসংহার(CONCLUSION)

SIGNIFICANT OF THE SUBJECT.

তথ্যসূত্র(REFERENCE)

গ্রন্থপঞ্জি(BIBLIOGRAPHY)

ক. আকর গ্রন্থ(PRIMARY SOURCE)

খ. সহায়ক গ্রন্থ(SECONDARY SOURCE)

গ. পত্রপত্রিকা(JOURNAL)

মুখবন্ধ (PREFACE)

"রাস্তায় চেনেনা কেউ

পথে মরলে বলবে, জনৈক অজ্ঞাতনামা লাশ,

কিন্তু এই দশনামী টং ঘরে, আমি রাজা,

প্রথম মণীন্দ্র গুপ্ত।"

- (মণীন্দ্র গুপ্ত/'কবিতাসংগ্রহ'/ 'আদম'/দ্বিতীয় সং, পৃ. ১৩৬)

এমনই আত্মগরিমায় গৌরবান্বিত কবি মাটিতে পা রেখে আর আকাশের দিকে মাথা তুলে বাংলা কবিতার শিকড়ে জলদান করার কাজটি প্রায় সারাজীবন নীরবে করে গিয়েছেন। এই বোধ ও বোধি থেকে উঠে আসা তাঁর কবিতা মহাজাগতিক ইশারা নিয়ে চল্লিশ পরবর্তী বাংলা কবিতার ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছে। কবির মৃত্যু হলে কবির পুনর্মূল্যায়ন হয়। কবিতার ইতিহাসে মৃদু স্বরে উচ্চারিত এক কবি। 'অক্ষয় মালবেরি'র স্বাদু গদ্যের মতো তাঁর কবিতার পেলব ভূমি আমাদের মুগ্ধ করে। পাশাপাশি বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় তিনি অভিজ্ঞ। তাঁর আগ্রহের জগৎটি প্রায় সীমাহীন, একদিকে মনুষ্য জীবনের সব ক্ষেত্রেই তাঁর মানস বিচরণ ছিল, অন্যদিকে তাঁর জগৎটি নিছক মনুষ্যলোকে সীমাবদ্ধ ছিল না - কীটলোক থেকে গ্যালাক্সিপুঞ্জ অবধি তাঁর সহজ বিহার। অর্থাৎ আদি থেকে উৎস, সৃষ্টি থেকে চলমান জীবনের মধ্যে তিনি আছেন। কবিতার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে সারাজীবনই বসবাস করেছে একজন চিত্রকর। তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে একজন চিত্রকরের সংযম, বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনের সমস্ত দৃষ্টি এবং তুষ্টি তিনি লাভ করেছেন প্রকৃতি থেকে।

অমেয় ভালোবাসায় মণীন্দ্র গুপ্ত দেখেছেন জীবনকে, যে জীবন মানব সমাজের মধ্যে সীমিত নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতিও তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে এক সন্তের শ্রদ্ধা এবং সমপ্রাণতা। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা কিংবা গদ্য পাঠে বুঝতে পারি, তিনি তাঁর সমকালের থেকে আলাদা অনুচ্চারিত এক কবিসত্তা। বহুতর বিষয় এবং মোহময় স্বর উচ্চারিত হয়েছে তাঁর সম্পাদনায়, চিত্রকল্পে এবং নিজস্ব বাক্‌প্রতিমায়। তাঁর কবিতা ধারাবাহিক পাঠের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে, তিনি অভ্যাসজাত কবি নন, কবিতাই তাঁকে কবি করেছে। ফলত একান্ত আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বশত তাঁর কবিতার প্রতি একরকম নিবিড় আগ্রহেই তাঁর কবিতা নিয়ে গবেষণা করবার সংকল্প গ্রহণ করতে বাধ্য হই। নিরুপাই হয়ে তাঁর কবিতার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করি।

সূচিপত্র(CONTENT)

ভূমিকা(INTRODUCTION)

ক. সমস্যার বর্ণনা (STATEMENT OF THE PROBLEM)

খ. অনুমান সাপেক্ষ সমস্যা (PROBLEM TO BE INVESTIGATED)

গ. গবেষণার লক্ষ্য (OBJECT OF THE RESEARCH

ঘ. যুক্তিবোধ্য অনুমান (HYPOTHESIS)

ঙ. গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ধারণ (RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY)

প্রথম অধ্যায়(FIRST CHAPTER)

কবির ব্যক্তিজীবনের নানা অনুষঙ্গ (KABIR BYAKTI JIBONER NANA ONUSANGO)

দ্বিতীয় অধ্যায়(SECOND CHAPTER):

পরমা ও কবি-চিত্রকর (PARAMA O KABI-CHITRAKAR

তৃতীয় অধ্যায়(THIRD CHAPTER):

কবিতায় সমকালীন সমাজ ও জীবন (KABITAY SAMAKALIN SAMAJ O JIBAN)

চতুর্থ অধ্যায়(FOURTH CHAPTER):

পঞ্চাশের কবিসমাজ ও মণীন্দ্র গুপ্ত (PANCHASER KABISAMAJ O MANINDRA GUPTA)

পঞ্চম অধ্যায়(FIFTH CHAPTER)

কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্তের অনন্যতা (KABITAY MANINDRA GUPTER ANANNATA)

ষষ্ঠ অধ্যায়(SIXTH CHAPTER)

কবিতায় মিথ ও আর্কেটাইপের ব্যবহার (KABITAY MYTH O ARCHETYPE-ER BYABOHER)

উপসংহার(CONCLUSION)

SIGNIFICANT OF THE SUBJECT.

সমসাময়িক কবিদের সাক্ষাৎকার(INTERVIEW WITH CONTEMPORARY POETS)

তথ্যসূত্র(REFERENCE)

গ্রন্থপঞ্জি(BIBLIOGRAPHY)

ক. আকর গ্রন্থ(PRIMARY SOURCE)

খ. সহায়ক গ্রন্থ(SECONDARY SOURCE)

গ. পত্রপত্রিকা(JOURNAL)

ভূমিকা(INTRODUCTION)

"আকর্ষণ কোন দিকে? -- জোয়ারের উচ্ছলতা থেকে আমি ভাটার দিকেই

বেশি টান বোধ করি। সেই জল পিছনের দিকে চলে, দুঃখিতের মতো

অধিকার ছেড়ে চলে যায়"।[১]

কবিতার পঙ্‌ক্তি থেকেই উপলব্ধি করা যায় ব্যক্তি কবির ব্যতিক্রমী চিন্তা চেতনার বহুমাত্রিক প্রকাশ। , প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ সৃজন উৎসে বাধা। -পঞ্চাশের দশকের কবিরা যখন রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা অর্থাৎ মার্ক্সবাদী ভাবাদর্শ আশ্রয় করে কবিতার বীজক্ষেত পুষ্ট করেছেন সেই সময় কবি মণীন্দ্র গুপ্ত নিভৃতে নীরবে আত্মমগ্ন হয়ে আত্মপ্রত্যয়জাত কবিতার মায়াজাল বুনতে চেয়েছেন; অথচ কালের গতি রুদ্ধ করে কার সাধ্য! কবি মণীন্দ্র সে সময় এক অনন্য পথের যাত্রী-চুলচেরা ফাটলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে গেছেন অচিনপুরে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো- 'আমরা তিনজন' (গ্রীষ্ম ১৩৫৬), 'নীল পাথরের আকাশ' (বৈশাখ ১৩৭৬), 'মৌপাকাদের গ্রাম' (শ্রাবণ ১৩৮১), 'লাল স্কুল বাড়ি' (পৌষ ১৩৮৪), 'ছত্রপলাশ চৈত্যে দিনশেষ' (আষাঢ় ১৩৯৩), 'শরৎমেঘ ও কাশফুলের বন্ধু' (মাঘ ১৩৯৮), 'নমেরু মানে রুদ্রাক্ষ' (২০০০), 'টুং টাং শব্দ নিঃশব্দ' (জানুয়ারি ২০০৫), 'বনে আজ কনচের্টো (নভেম্বর ২০০৯)', 'মৌচুষি যায় ছাদনাতলায়' (জানুয়ারি ২০১০), 'এক শিশি গন্ধহীন ফ্রেইগ্রানস' (২০১০), 'নিরক্ষর আকবর' (জানুয়ারি ২০১১), 'বাড়ির কপালে চাঁদ' (জানুয়ারি ২০১৪)।

কবিতা সম্পর্কে কবি তাঁর রচিত প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন : "কবিতা অঙ্কের মতো একটি হিসেবের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে নির্মিত এক অমোঘ উত্তর-ফল নয়। কবিতা একটি জীবিত প্রক্রিয়ার ফল, এবং সে স্বয়ংও প্রচণ্ডভাবে জীবন্ত এবং যেহেতু সে জীবিত, সেইহেতু তার ভঙ্গির ও গঠনের বিচিত্র উন্মেষের আর শেষ নেই। যেহেতু জীবিত, সেইহেতু একটি কবিতা একবারই জন্মায়"।[২] এভাবেই 'চাঁদের ওপিঠে', 'পরবাসী, কুড়ানী ও দারুমা সান', 'জন মানুষ ও বন মানুষ', 'নতুন লেখা', 'উল্টো কথা', 'যোগিয়া বাড়ি', 'দ্রাক্ষাপুঞ্জ, শুঁড়ি ও মাতাল' গ্রন্থগুলিতে গদ্যের সুললিত ভাষ্যে রচনা করেছেন কবিতার জন্মের ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যময় জগতকে রূপ ও অরূপের গ্রন্থনায়।

কবিতার মধ্যে যে প্রাণস্পন্দন তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন আজীবন। ি ও কবিতা হয়ে ওঠে একে অপরের পরিপূরক। যেমন সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় তাঁর সৃজনশক্তিকে ছড়িয়ে

দিলেও সর্বত্রই কবিত্বের স্ফুরণই দেখিয়েছেন; তেমনি মণীন্দ্র গুপ্তের উপন্যাস, প্রবন্ধ, আত্মজীবনীর মধ্যেও কবিতার প্রাণ ভ্রোমরা আত্মগোপন করে আছে সুললিত ভাষায়, পেলব উচ্চারণে এবং প্রকাশ ভঙ্গির মাধুর্যময় আঙ্গিক নির্মাণে। সর্বোপরি ব্যঞ্জনাবহুল প্রকাশ ভঙ্গিতে। এমনই কবিতার অন্তর্লোকে মনন ও দর্শন জাত রূপের মাধুরি অনুসন্ধানই আমার অন্বিষ্ট।

তথ্যসূত্র: ১. মণীন্দ্র গুপ্ত, 'কবিতা সংগ্রহ', দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬, পৃ. ৫২

২. মণীন্দ্র গুপ্ত, 'গদ্যসংগ্রহ ১', তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৮, পৃ. ১৩

প্রথম অধ্যায় : কবির ব্যক্তিজীবনের নানা অনুষঙ্গ

অধুনা বাংলাদেশের জল-হাওয়ার নদীমাতৃক বর্ধিষ্ণু গ্রামে মণীন্দ্র গুপ্ত ১৯২৬ সালের অক্টোবর (বাংলা ৭ কার্তিক ১৩৩৩) জন্মগ্রহণ করেন, সাহিত্য আকাদেমিতে প্রকাশিত 'Meet the Author' (27 March 2014) গ্রন্থের ভাষায় "Born in the association of nature in 1926, Manindra Gupta spent his childhood days in his ancestral village in East Bengali, where channels criss-cross the localities and boats are the main source of transportation." [১]

কবির পংক্তিমালায় এক অপূর্ব কাব্যভাষায় রূপায়িত হয়েছে পূর্ব বাংলার সেই মনোরম রূপমুগ্ধ রূপ।

:

"ওই বাঁশ ঝাড় তলে, ওই তারাবন নিয়ে কোলে, আমার শৈশব

বন্দী হয়ে শুয়ে থাকে, খেলে, ঘোরে"। [২]

'অক্ষয় মালবেরি' (১৯৮১) নামে তাঁর আত্মকথা মূলক গ্রন্থটির অপূর্ব বর্ণনায় তাঁর যাপিত জীবনের বহু অনুচ্চারিত কথা প্রকাশের আলোয় আসে। র কথা বলতে বসে, সেই স্মৃতির কথাস্রোতকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বছর বাইশে পৌঁছে। মণীন্দ্র গুপ্তের প্রায়ই 'মনে হতো, কোনও দুর্গম কারণে সংসারে আমি অস্বাভাবিক এবং একা।'[৩] আসলে বিশ্বসংসারে মানুষ নিয়তই একা। যখন সে বুঝতে পারে তার চিন্তন বিশ্বের দোসর হিসেবে অন্য কোনও মানুষের সঙ্গ কামনা করাই বৃথা তখন সে নিঃসঙ্গ অন্তর্লোকে নিজস্ব নির্মোকে মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। এইভাবে গুটিয়ে ফেলা এবং শামুকের মতো

ছড়িয়ে পড়ার জীবন নির্মিত হয় মৌলিক চৈতন্যের দৌলতেই। সে জীবনানন্দের মতো বুঝতে পারে ‘নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা।’ যখন ব্যক্তি-মানুষ তার চৈতন্যের দাঁড় বেয়ে ক্ষুদ্র ‘আমি’ থেকে বৃহৎ ‘আমি’র দিকে ধাবিত হন তখন বৃহৎ চৈতন্যের সীমারেখা অন্য কাউকে পাবেন না এটা তো স্বাভাবিক। সে কারনেই নিজস্ব নির্জনে তাঁর সৃজন উৎসে অজান্তে নিজেই কখন সংসারে থেকেও বিশ্ব সংসারি হয়ে ওঠেন অর্থাৎ বিবেকি চেতনায় নিজেই আভূমি এক মৌলিক অনুপম বিশ্ব রচনা করে নেন। দুষ্টুমি করে মারধরের খুনসুটিতে বালক মণীন্দ্র আসলে নিজেকেই খুঁজতে বেরোতেন। 'আমি মুখ নিচু করে দুঃখকে খুঁজতাম, মাটিতে কোথায় সে গেঁথে আছে ভাঙা সবুজ বোতলের টুকরো হয়ে'।[৪] কাচের মতো নিজেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ প্রসারিত জীবনের মোহময় প্রাণ প্রাচুর্যে নিজেকে সতত জীবনের মধ্যে মুখর করে তুলবার আন্তরিক অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে এখানে। যে জীবন একা জীবন, একলার জীবন সে জীবনকে বহুজীবনের মধ্যে মিশিয়ে, ছেনে অথবা মন্থন করে নিজের জীবনকে মিলিয়ে নেওয়ার এও একধরনের অভিপ্রায়। জীবনের রক্ত-পুঁজ ঘেঁটে পরখ করার অর্থই হল অন্যজীবনকে নিজস্ব জীবনের ছাঁচে ফেলে শানিত করা। সংকীর্ণ জীবনের মধ্যে নিয়ত নীরব থেকে মানুষের ব্যপ্তি নেই, মানুষের মুক্তি নেই, এরই বিপ্রতীপ মেরুতে আত্মপ্রত্যয়জাত কবির দৃঢ় অবস্থান হবে এটাইতো স্বাভাবিক। 'ভিতরে একা সুখি না, দুঃখীও না দশদিকে অসীম শূন্য ও চিররহস্য'।[৫] ভেতরে ভেতরে একা একা কূপমন্ডুকের মতো সংকীর্ণ চৈতন্যসীমায় আক্রান্ত না থেকে কবি প্রসারিত বিবেকের মোহনায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন বহু-জীবনের সংগমে। চারিদিকে অসীম শূন্য ও রহস্যময় ফানুসের মোহময়ী রূপ-চাতুর্যে আকৃষ্ট হওয়া যে সংকীর্ণতারই নামান্তর তা তিনি বুঝতেন বলেই, আন্তরিক বিবেকী বীক্ষণের কাছে একা অর্থাৎ আপন কাব্যভূমিতে তিনি বৃহৎ হওয়ার স্বপ্ন বপন করেছেন। একাকীত্বের এই বোধ কবিকে পরিণত করেছে দার্শনিক তাত্ত্বিকে।   মাস বয়সে মাকে হারিয়ে প্রতিবেশীদের ক্রমাগত খেদের কারণে কবির মনে হতো, কোনও দুর্গম কারণে সংসারে তিনি অস্বাভাবিকভাবে একা। ছেলেবেলায় একা থাকার কষ্ট এবং অসহায়তা বোধের দ্বৈরথে বোধ ও বোধি তাঁর সারাজীবনের সার-সংকলন, এ কথাও তিনি উপলব্ধি করেছেন।

েন দাদু ঠাকুমার স্নেহে। আট বছর বয়স পর্যন্ত কোনোও ক্রমে স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখে হাওড়ার জুট মিলে চাকরিতে যোগ দেন। সুতরাং এ থেকেই স্পষ্ট হয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাঁর হাতে নেই। সুস্থ জীবনের রসদ তাঁর অনায়ত্ত। সে কারনেই একজন ‘কবি’কে মজুরের কর্মে লিপ্ত হতে হয়। ১৯৬৯ সালে 'পরমা' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবি জীবনের শুরু। এই পর্বে আমরা দেখতে পাই, কবির আত্মবিচ্ছুরণ, আত্মবিস্ফোরণ। অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করবার যোগ্যতম প্লাটফর্ম। যেখানেই দাঁড়িয়েই লক্ষে পৌঁছানোর গতিতে ধাবিত হওয়া যায়। ‘পরমা’ পত্রিকায়

একাধিক গদ্য ও কবিতা লিখে নিজের আসল আত্ম-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা দিতে থাকেন। একে একে, কবি মণীন্দ্র গুপ্ত হয়ে ওঠার ভূমি মজবুত হয় এখান থেকে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'আমরা তিনজন' (গ্রীষ্ম, ১৩৫৬) নামে। - সুনীল বসু, ভগীরথ মুখোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্র গুপ্ত এই তিনজন কবির পাঁচটি, সাতটি ও ছয়টি মোট আঠারোটি কবিতা নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। এই যৌথ সম্মিলনী সৃজন প্রক্রিয়ায় নিজেকে সমান অংশীদার করে নিজস্ব বিবেকের কথা বলেছেন তিনি যেখান থেকে তাঁকে আমরা আলাদা করে নিতেই পারি। উপন্যাস, প্রবন্ধ সব মিলিয়ে অনেক সারস্বত সৃষ্টি ছড়িয়ে আছে তাঁর মনন ও দর্শনজাত গবেষণায়। ২০১৮ সালে ৩১ জানুয়ারি বিরানব্বই বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি। কবিদের মৃত্যু হয় না কখনও। কবিরা তাঁদের সৃজন সম্ভারের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকেন মনুষ্য মননে। মণীন্দ্র গুপ্তও বেঁচে থাকবেন মনুষ্য যাপনে তাঁর নিহিত বাচন ও কাব্যের মায়াভূমি দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

১. গৌতম মন্ডল (সম্পা.), ‘আদম’, মার্চ ২০১৮, পৃ. ৪৮

২. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘কবিতা সংগ্রহ’, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬, পৃ. ৫২

৩. তদেব, পৃ. ৩২

৪. তদেব, পৃ. ৫৪

৫. তদেব, পৃ. ৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়: পরমা ও কবি-চিত্রকর

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত বহু পত্রিকা 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', ঠাকুরবাড়ির সারস্বত সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ মাধ্যম ছিল। কবিসাহিত্যিকদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এভাবেই বহু পত্রপত্রিকার প্রকাশ জরুরি ছিল। মণীন্দ্র গুপ্ত এই একলা মানুষটি কিন্তু শুধুমাত্র নিজের কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য 'পরমা' প্রকাশের উদ্যোগ নেননি, তাঁর লক্ষ্য ছিল অজানা অচেনা কবির অপ্রকাশিত উচ্চারণের লালন ক্ষেত্র তৈরি করা। বহু নামজাদা কবি যেমন প্রচার ও আড়ম্বরের মধ্যে থেকে

নিজেদের চারিয়ে দিতে পছন্দ করেন, উল্টোদিকে তেমনই বহু অনামা কবি আছেন যাঁরা প্রচার প্রদীপ্তির বহু যোজন দূরে অবস্থান করেও আপন বিশ্বাসের প্রতি অটুট এবং সেই মেজাজ ও মনোবীজ নিয়েই কাব্যের মায়াজাল রচনা করেছেন। যাবতীয় কবি-অকবিদের রচনাই তাঁরা ছেপেছেন। প্রচলিত অভ্যাসের লিখনজাত গতানুগতিক কবিতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া কবিতাটি বেছে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন বিবেকী বিচক্ষণতাই।

গুরুত্ব দিয়েছেন তন্ত্রসার কবি হিসেবে। আসলে এই তন্ত্রের আধারে রমেন্দ্রকুমার মনুষ্যজীবনের খুঁটিনাটির জটিল বিশ্লেষণ করেছেন। যার মাধ্যমে উঠে এসেছে জীবন ও জগতের কঠোরতম সত্যভাষণ। বস্তুত 'পরমা'র প্রধান আকর্ষণও ছিলেন তিনি। বিশুদ্ধ কবিতায় আগ্রহ ছিল মণীন্দ্র গুপ্তের।

-যাপনে যিনি

কবিতাকে লালন করে আসছেন আজীবন তাঁর কবিতা নির্বাচন যে সর্বোপরি সফল হবে এটাই স্বাভাবিক। একটি ভালো কবিতাকে বেছে নেওয়ার রুচি ও পরিশীলন ছিল তাঁর। সেক্ষেত্রে তিনি যে সফল ছিলেন বলাই বাহুল্য।

'পরমা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯ সালে। তাঁর কবিতার জাদুকাঠি স্পর্শে এই পত্রিকার পথ চলা শুরু। তিনি এখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। এই পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রিকার প্রচ্ছদ নির্মাণেও তাঁর অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত! ছবির মাধ্যমে একসময় আমরা বিশ্বব্যবস্থার রূপ প্রত্যক্ষ করেছি সালভাদোর দালির মাধ্যমে। সমূহ অর্থে মনুষ্য জীবনের ও মননের আত্মিক সংকটের মুহূর্তে যে ছবি দালি আমাদের দেখিয়েছিলেন তাতে নিজেদের ছায়ার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। চিত্র এমনই একটি শৈল্পিক প্রকাশ মাধ্যম যা ভাষাহীন অক্ষরেখায় বহু অর্থের মাত্রা যোজনা করে। তেমনই মণীন্দ্র গুপ্তও এ বিষয়ে অত্যন্ত পারঙ্গম মণীষার অধিকারী তা তাঁর প্রতিটি প্রতিরূপ অর্থাৎ প্রচ্ছদ নির্মাণের পরিকল্পনায় পরিলক্ষিত হয়। কবি যখন ছবি আঁকেন তখন তা একটি কবিতার চিত্রকল্প গড়ে তোলে। যা আসলে বিধ্বস্ত সময় মন্থন করা মনুষ্যজীবনেরই ছায়ার প্রতিরূপ। যখন কবিতা লেখেন সেখানেও ছবি ধরা পড়ে - 'একটু দূরে নিচু ডোবা-/সবুজ ঘরের তলে স্তব্ধ হয়ে আছে নীল জল'।[১] কিংবা 'মাছরাঙা - চিল - বকের খাবার নিয়ে/ ছোট পুকুরটি যেন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে[২]।'

া বিচিত্র ও বিস্মৃতপ্রায় কবিতার সংরক্ষণ করেন এই পত্রিকার মাধ্যমে। মাটিতে পা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বাংলা কবিতার শিকড়ে নিরলস জল

সিঞ্চন করে গেছেন।

তথ্যসুত্র:

১. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘কবিতাসংগ্রহ’, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬, পৃ. ২৫

২. তদেব, পৃ. ২৮

তৃতীয় অধ্যায়: কবিতায় সমকালীন সমাজ ও জীবন

কবি নজরুল যেমন নিজেকে বলেছেন, 'যুগের কবি নন, হুজুগের কবি'; তেমনি অনুচ্চারেই সব কবিই সমকালের কবি। যুগের হাওয়াকে অস্বীকার কোন সাধকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সেখানেই ব্যতিক্রম। তাঁর কবিতা কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা স্বরূপ পাল্টা প্রতিরূপ নয়। আদিম লতা গুল্মময় এই কবি জীবনের জঠরে বসে কবিতার বহু বিকীর্ণ শিকড় বিস্তারের মধ্যে দিয়ে যেন নিজেই একটি অনন্ত বৃক্ষ। যার শিকড়ের প্রাচুর্যে গ্রথিত হয়ে আছে বহু ভূমা ও ভূমি। নিজস্ব চেতনায় স্বতন্ত্র কাব্যভাষায় যেমন সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা তেমনই সময়াতীত সুদূরের ব্যঞ্জনাবাহী আকল্পে না বলা কথার উদ্ভাসে তাঁর কবিতার বীজতলা প্রসারিত হয়ে গেছে বহু যোজনব্যাপী।

ে রূপ দিয়েছেন। তবু, কবির জীবন, কবির ভাবনার আলোয় তাঁর নিজের কবিতাকে দেখারও একটা দৃষ্টিকোণ থাকে। শেষ পর্যন্ত জীবনকে চেনবার জন্যই তো শিল্পের নির্মাণ।

তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে মানুষের জীবনলিপি। গাছপালা, যুগচেতনা ও স্মৃতিচারণা। দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র, পিতা পুত্রের প্রজন্ম শূন্যতার যন্ত্রণা সহজাত ও স্বতস্ফুর্ততায় কবিতায় অনন্য ভাষা রূপ লাভ করেছে। যেমন : 'যত কাছাকাছি থাকছে, তত তারা চিনতে পারছে না একে অপরকে। দুজনাই লোক ভালো, তবু ভাবে ...' [১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে মানুষের বন্ধু-স্বজন নেই, সৌভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন নেই। বন্ধু নামক সম্পর্ক ও সন্দেহের যূপকাষ্ঠে আটকে আছে নরন্তর। পিতা পুত্রের প্রজন্ম শূন্যতার যন্ত্রণা আসলে বন্ধ্যা বিশ্বের বন্ধ্যা সম্পর্কের সমার্থক : 'বাপের সুপুত্তুর নই বলে বাপ মার মনে বড় দুঃখ'। কখনও আবার একাকী

মেয়ের পিতার সন্ধানে সে কতখানি মানসিক শান্তি পায় তারই বর্ণনা দেখা যায় এই কবিতায়। যেমন : 'মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে তার বাবার এইখানে এসে দেখা হল/ পৃথিবীতে এতদিন একলা থাকতে থাকতে মেয়েটা পাগল-পাগল হয়ে গিয়েছিল'[২]।

তাঁর কবিতায় অনায়াসে ও স্বতস্ফুর্ততায় যুগ চেতনার লক্ষণ দেখা যায় : 'এক দঙ্গল সমকামী আর হিজড়ের মণ্ডলীর মধ্যিখানে নেচে নেচে বাঁশি বাজিয়ে শোনাচ্ছিল'[৩]। 'সমকামী' শব্দের মধ্যে প্রতিফলিত হয় সংকীর্ণ জীবনের সীমা চৈতন্য। অর্থাৎ প্রসারিত বিবেকে কোনও বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ তাঁর কাছে দুর্লক্ষ্য। এতে স্পষ্টই বোঝা যায়, একজীবন ছেড়ে আর এক জীবনের নন্দনে পৌঁছোতে দুঃসাধ্য। আন্তরিক গন্ডিতেই সমকালীন কালখন্ডের মানুষ নেচে নেচে ঘুরপাক খায় এক জীবনের নাগরদোলায়।

স্মৃতিচারণায় ছেলেবেলার দুঃখ, যন্ত্রণা, একাকীত্ব কবিতায় আশ্রয় পেয়েছে : 'ছ মাসের মা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল/--- তোমাদের ছেলে-- এবার তোমরা বোঝো'[৪]। কবিতার মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন এত সুন্দর বর্ণনায় ধরা পড়েছে, যা আমাদের বিস্মিত করে।

মণীন্দ্র গুপ্তের কাব্য ভুবনের একতম অবলম্বন জীবন। তাঁর কাছে সমগ্র জীবন একটা বিষয় - বাঁচার বিষয় এবং শিল্পের বিষয়। এই সমগ্র জীবন বিষয়টিকে টুকরো-টুকরো করে বহু কবিতায় ছড়িয়ে দিতে চান। যেমন দেখেছি 'জীবনায়ন' কবিতাটিতে – 'জীবন দুর্জয় ছিল/ ঘরছাড়া যাযাবর বন্য মানুষের।/ তাদের সন্তান আমি, আধুনিক এক মানবক – বিবর বুভুক্ষু আত্মা।'[৫] যে কবির আত্মার স্পন্দনে স্পন্দিত হয় জীবনের দুর্জয় বাসনা, গার্হস্থ আশ্রমিক খুঁটি তাঁকে সংকীর্ণ গৃহগত নীড়ে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। ঘরছাড়া যাযাবরী অন্য জীবন বন্য জীবনের মোহময় নন্দনে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে দেন। যে জীবনের নির্দিষ্ট কোনও সরণি নেই, নির্দিষ্ট দাড়ি-কমার শাসন নেই আবহমান অন্তহীন হাইফেনের মতো যে জীবন এগিয়ে যায় নিজস্ব কল্পিত ভুবনের দিকে। তিনি জীবনমগ্ন দ্রষ্টা। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে আমাদের মন পল্লবিত হতে থাকে।

তথ্যসূত্র:

১. মণীন্দ্র গুপ্ত, 'কবিতাসংগ্রহ', দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬, পৃ. ৩৫

২. তদেব, পৃ. ৩৯

৩. তদেব, পৃ. ৪৩

৪. তদেব, পৃ. ৫৮

৫. তদেব, পৃ. ৭২

চতুর্থ অধ্যায়: পঞ্চাশের কবিসমাজ ও মণীন্দ্র গুপ্ত

"কোনটা চান আপনি? একজন জীবিত কবির প্রেত হতে, নাকি মরণের পরে

কবিদেহে পুনরুত্থিত হতে ?" [১]

বিশ্ব সাহিত্যের আদি উৎস জানলে আমরা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু কবির মুদ্রিত নাম দেখতে পাই। কিন্তু তাঁদের সৃজিত রচনার নিদর্শন সচরাচর হাতে পাই না। এ একধরনের মৃত্যুরই নামান্তর। ‘কবি’ শব্দ তখনই নামের আগে বসে যখন তিনি ‘কবিতা’র জন্ম দেন। কিন্তু কবিতা নামক কোনও সাহিত্য গুণহীন চর্বিতচর্বন রচনা এ ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত অর্থাৎ ‘কবি’ নাম নিয়ে প্রচার প্রদীপ্তির মোহজালে নিজেকে আবিষ্ট করে রাখা আসলে একরকম নিজেরই মৃত্যু ধার্য হওয়া। সুতরাং মনুষ্যজীবন কালের নিয়মে বিসর্জিত হলেও কবি থেকে যায় আবহমান, অন্তহীন...। মণীন্দ্র গুপ্তের প্রথম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। দীর্ঘজীবন ধরে কবিতাচর্চা করলেও তাঁকে অধিকাংশ সমালোচক ছয় ও সাতের দশকের কবি হিসেবে রাখতে চেয়েছেন। দেবারতি মিত্রের কথায় - তাঁর বয়স ও কবিতার সূচনাকালের কথা ভাবলে তাঁকে চল্লিশের কবিদের মধ্যেই ফেলা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর ধ্রুপদী মানসিক গঠন, দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্যে আগ্রহ এবং নিজের কালকে অতিক্রম করে চিরন্তন সময়কে ধরে রাখবার অতি আন্তরিক প্রয়াস ত্রিশ দশকের কবিদের কথা মনে করিয়ে দেয়। আর ভালো করে ভেবে দেখলে পঞ্চাশ দশক ক্ষীণ পরম্পরায় ত্রিশেরই শিষ্য, তাই সব দিক ভেবে মণীন্দ্র গুপ্তকে আমরা পঞ্চাশের দশকেই জায়গা দেব। আসলে কবিদের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে দশক একটি অবৈজ্ঞানিক ধারণা। কবি কোনও ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেবেন না। বিশ্ব সংসারের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে আপন চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে জায়মান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা প্রকাশ করবেন আরও বৃহৎ বিবেক দিয়ে। শঙ্খ ঘোষের কথায়- ‘দশক’ একটি ‘খাঁচা’।

বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্ন লালন করা মানুষ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পেল বটে কিন্তু প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির সংযোগ সেই অর্থে থাকল না।

করতে হলো। এই অপূর্ণতাজনিত কষ্টবোধ থেকে কবিরাও তাঁদের কাব্যভূমিতে সে কথা প্রকাশ করে গেলন। পঞ্চাশের দশকের নির্দিষ্ট কোনও শ্রেণী চরিত্র নেই। এইসময়ের কবিরা হলেন- আলোক সরকার, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রমেন্দ্র কুমার আচার্যচৌধুরী, কবিতা সিংহ, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ। আলোক সরকার মানবিক সংরক্তহীন, তার মধ্যে থেকেও একরকম মহাজাগতিক ইশারার কবিতা লিখে গেলেন। শঙ্খ ঘোষ কবিতার নাম নিয়ে জাগ্রত বিবেকী চেতনায় একরকম চমকপ্রদ লাইন লিখে বাংলা কবিতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ফুটন্ত যৌবনের যুবক-যুবতীর মন ভোলানো কবিতার পঙ্‌ক্তি লিখে কাব্যভুবন মাতিয়ে থাকেন। রমেন্দ্র কুমার আচার্যচৌধুরী তন্ত্রের আড়ালে কবিতার মহীরূহ স্থাপন করেছেন একলার আকাশে। কবিতা সিংহ গতানুগতিক নারীবাদের বিপ্রতীপে বর্তমান সময়ের নারীর অবস্থানগত বাস্তবতার প্রেক্ষিত রচনা করেছেন প্রাচীন পুরাণ ও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে। বিনয় মজুমদার একাকিত্বের জীবনের মধ্যে থেকেও তাঁর গীতিকাব্যে যৌনতার সঙ্গে গাণিতিক বিজ্ঞান সমন্বিত কবিতার কথা বলেছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকৃতির প্রাণ প্রাচুর্যে বড়ো হয়ে বল্গাহীন কবিতার রাশ রেখেছেন নিজের হাতে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বিভিন্ন দেশের কাব্যকথা মন্থন করে নিজস্ব কবিতার আকল্প গড়ে নিয়েছেন অজান্তে।

পঞ্চাশ দশকের এইরকম বহু বিকীর্ণ ও বিচ্ছুরিত সুর ও স্বরের মাঝে বাস করেও মণীন্দ্র গুপ্তের জগৎ অনেকটাই আলাদা, অবশ্যই তা ভিন্ন মাত্রা বহন করে। তাঁর স্বরক্ষেপণ তির্যক ও ব্যঞ্জনাময়। যা একমাত্র তাঁরই আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা সর্বোপরি কবি অস্তিত্বের মূল চাবিকাঠি। তাঁর দৃষ্টি তিরের মতো শানিত। প্রকাশ ব্যঞ্জনাময় ও বহুমাত্রিক। আঙ্গিক ও শিল্পশৈলী নির্মাণে তিনি অবশ্যই এঁদের থেকে বহু দূরের বাসিন্দা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই মৌলিকতা বা স্বতন্ত্রতার বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘গদ্যসংগ্রহ ১’, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৮, পৃ. ৩১

পঞ্চম অধ্যায়: কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্তের অনন্যতা

পঞ্চাশের দশক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দশক। মসীলিপ্ত বাস্তবতার সময়পর্বে দাঁড়িয়ে চল্লিশের চিন্তা বহন করেও এই কবিরা নিজস্ব কবিতার একটা জগৎ নির্মাণে সতত মুখর ছিলেন। যে কোনও দশকের একরকম চরিত্র থাকে। কিন্তু পঞ্চাশের কবিরা সবাই–ই আলাদা আলাদা নিজস্ব কাব্যসাধনায় একাকী কারও কবিতার সঙ্গে কারও কবিতার যুগপৎ মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিকই কিন্তু তাঁরা সবাই স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে কাব্যচেতনা ও প্রকাশ গুণের নিরিখে মণীন্দ্র গুপ্ত বলিষ্ঠ একটি জীবন ও জগতের সন্ধান করেছেন, যা তাঁর একান্তই নিজস্ব কাব্যবীক্ষার ফল: 'কবি একদিকে চান কবিতায় নিজেকে উন্মীলিত করতে, অন্যদিকে কবিতাকে চান গোপন করতে। সত্যি কি চান তিনি ? - গোপন করতে, না, গহন করতে ?' [১]

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সারাজীবন ব্যয় করেছেন। কবিতা সম্পর্কিত তাঁরই গদ্য রচনায় আশ্চর্য ভাবনার বিস্তার দেখা যায়। কবিতার অলৌকিকতা বা রহস্যময়তাকেই তিনি বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান করেন: ''পরিশ্রম করি, পরীক্ষা করি- একটি বীজ-শব্দ খুঁজে আনতে আমার পূর্ণ রাত্রি যায়, তমসাময় অন্বয় থেকে একটি বাক্যকে জাগাতে কাটে সপ্তাহ''।[২] জন্ম, মৃত্যু আর জন্মান্তর - বীজ থেকে গাছপালা, ফুল-ফল, তাদের ঝরে পড়া, বীজে ফেরা নানা রঙে, রূপে, বেদনায়, মাধুর্যে, কৌতুকে তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে আসে। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের জন্মান্তরবাদ তাঁর গাঢ় ও স্থির বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। কবিতা সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি ব্যঞ্জনাগর্ভ - "উৎকৃষ্ট কবিতার দুর্মর জীবনীশক্তি অনেকটা যেন সেই বিশুষ্ক পদ্মবীজের মতো, যা হাজার বছর পরেও অনুকুল ক্ষেত্রে পুঁতলে আবার বেঁচে ওঠে, ফুল ফোটায়।" [৩]

পরিশ্রমী, সংগ্রাহক কবি মণীন্দ্র গুপ্ত প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর নিজস্ব জগত তৈরি করেছেন। তাঁর গদ্য সংগ্রহের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দেখে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি তাঁর বৈদগ্ধতা। ঋগ্বেদ থেকে চিনা কবিতা, গীতা থেকে গ্রন্থসাহেব আর্থ রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে আপেক্ষিক তত্ত্ব। পঠিত জগত ধীরে ধীরে তাঁর জীবন যাপনের সঙ্গে মিশে গেছে। মূলত তাঁর গদ্যে বিষয়বস্তু নিজস্ব শৈশব - যৌবন - বার্ধক্য আর মৃত্যু ভাবনাকে স্পর্শ করেই এসেছে। কিন্তু সবই আত্মগত রচনা নয়, বিষয়গত রচনাশৈলী চোখে পড়ার মতো।

‘একশ দু’শ পাঁচশ বছর আগেকার কথা

একজন দাদু আর তার দুটো নাতি তিন কোনায়’।[৪]

ছেলেবেলায় দাদুর সাথে কবির যে সম্পর্ক ছিল তা সহজ স্বাভাবিকতায় নিজস্ব দর্পণে কবিতায় ধরা পড়ে। ‘বনে ঘুরে ঘুরে ঠাকুরদাকে একদিন সবুজ পাতার একটা টুপি এনে দিল সে/ দাদু ফোকলা দাঁতে হেসে আকুল’।[৫] দাদু ঠাকুরদার স্মৃতি বিজড়িত স্নেহ, আদর তাঁকে কবিতায় বাঁচিয়ে রাখে।

আবার যখন লেখেন- ‘এই দীর্ঘ রাত ধরে আমি চমকে চমকে উঠছি-- / কে আমাকে ছবির পর ছবি দেখাচ্ছে’।[৬] এখানেই কবির চিত্রকর হয়ে ওঠার স্বপ্ন ভাষা পায়। নিজের কবিতা সম্পর্কে মণীন্দ্র গুপ্ত সচেতন ভাবেই বলেছেন – “জন্ম থেকে এই জগতকে পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছি, আর তার বিচিত্র অর্থ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। নিজে একা একা এইসব নিয়ে কথা বলি। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই কথা বলাটাই কবিতা। জগতকে আমি দেখি কালস্রোতের মধ্যে - কখনও উদাসীনভাবে বহমান, কখনও অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের আলাদা আলাদা ঘরে স্থানু। যতদিন বাঁচি তার সঙ্গে আমার সংযোগ, সঙ্গম, সম্পর্কের আশ্চর্য কথা বলে যাই। মনে হয়, আমার জীবনের সম্পূর্ণ অসার্থকতার মধ্যে, শেষপর্যন্ত, এটুকুই সার্থকতা।”[৭]

এই চলাচলকেই তিনি বিস্তৃত করেছেন তাঁর কবিতায় –

> “দিন যায় পরতে পরতে জমে ধুলো। সে চলে যাবার পর
> অর্গানের রীডে – যাকে আমি সুরের পাঁজর বলতাম –
> আর কেউ আঙুল রাখে না। না রাখুক, আমি বেশ আছি।” [৮]

কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা সমস্ত আরোপিত উপলব্ধির স্থিতিস্থাপকতা পেরিয়ে এক সজাগ এবং গভীর সম্ভাব্যতার সাংকেতিক গ্রন্থনায় পৌঁছে দেয় আমাদের।

> “বাউলের মতো আমি ভিতরে জ্বালার বাতিঃ এই অলীক
> ঘুরিয়ে মেরেছে বহুদিন। বহুদিন এই জন্য নির্বাপিত থেকেছি আঁধারে।
> ঐ টিমটিমে নিজস্ব বাতির জন্য এত লোভ! – এই এক অভিমান, মায়া।
> তবু ভাগ্য, ঈশ্বর আমাকে ফিরিয়েছেন ঠিক পথে – রোদ্দুরে, কাদায়, জলাধারে,
> মোষের মতন পাঁকে। সাপের মতন পদ্মবনে, সন্ন্যাসী – বাঁদর – অভিমানে।”[৯]

পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, সামগ্রিক প্রতিকূল অবস্থানের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে জীবনমিতির এক আশ্চর্য পরিক্রমণে আঁকড়ে ধরেন জল-মাটি আর নৈসর্গিক বস্তু সমূহের পরিচর্চাকে।

"কবিতা রচনার মুহূর্তে আমি নিঃসর্গ – আমারই সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। নিজের মধ্যে ঢুকে ঢুকে নিজেকেই চিন্তা করাই। চিন্তার ভাষায় খুব ঠারঠোর থাকে, ইঙ্গিত থাকে – তখন হাতের লেখা হয় শর্টহ্যান্ডের মতো। যে কবিতা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়, তখনই না লিখলে নয়, তার বেলা এইরকম।" [১০] এই জটিল চিন্তারাশি জঙ্গলঝোরার জলে ধুয়ে আনার কবি মণীন্দ্র গুপ্ত। শব্দবন্ধের জাল বুনে কবিতার সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি রহস্যের কেন্দ্রে স্থাপিত প্রতীকি ব্যঞ্জনা ও চিত্রকল্প। চিত্রশিল্পীর নিপুণ দৃষ্টি তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে এক চিত্রশালা। পংক্তিতে পংক্তিতে অলংকার, চিত্রময়তা তাঁর কবিতায় এনে দেয় জাদুর স্পর্শ। যেমন –

ক. 'প্রজ্ঞা নয়, আমি খুঁজি, মায়ার গহন গূঢ় বাড়ি/ আমি জানি, সেইখানে অনন্তকালের লতাজাল।'[১১]

খ. "সেই ভূগর্ভের দেশে সাপ ও প্রেতাত্মা ছাড়া কারো পক্ষে নামা অসম্ভব।/শুধু অসমসাহসী জল নিচের পাথরে পড়ে হাড় ভেঙে ফেলে/ হামা-দেওয়া, ঘাড়-কুঁজো অপবৃক্ষদের দেখে আঁতকে উঠে মরে গেছে।"[১২]

গ. 'দুপুরের রৌদ্র এসে সেই ফাঁকে চুরি করে নিয়ে / তেপান্তর মাঠে দিল ছেড়ে'।[১৩]

আশ্চর্য, গভীর সব চিত্রকল্পে রচিত এই কবিতাগুলি তাঁর অস্তিত্বদর্শনের এক অমোঘ অ্যালিগরি। বিমূর্ত প্রজ্ঞা নয়, এই মূর্ত জগৎ সংসারের গহনে এক সর্বব্যাপী 'মায়ার বাড়ি'-র খোঁজই কবি মণীন্দ্র গুপ্তের সকল কবিতার আসল খোঁজ। এভাবেই তাঁর জীবন মন্থন, এভাবেই তাঁর কবিতা যাপন।

তথ্যসূত্র:

১. মণীন্দ্র গুপ্ত, 'গদ্য সংগ্রহ ১', তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৮, পৃ. ২১

২. তদেব, পৃ. ৭৫

৩. তদেব, পৃ. ৮৪

৪. মণীন্দ্র গুপ্ত 'কবিতাসংগ্রহ', দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬, পৃ. ১১২

৫. তদেব, পৃ. ১১৪

৬. তদেব, পৃ. ১২২

৭. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘গদ্য সংগ্রহ ১’, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৮, পৃ. ১১৮

৮. মণীন্দ্র গুপ্ত ‘কবিতাসংগ্রহ’, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬, পৃ. ৩৮

৯. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), ‘পরিকথা’, সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৪, পৃ. ১১৬

১০. মণীন্দ্র গুপ্ত ‘কবিতাসংগ্রহ’, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬, পৃ. ৪৭

১১. তদেব, পৃ. ৫৪

১২. তদেব, পৃ. ৮২

১৩. তদেব, পৃ. ৯০

ষষ্ঠ অধ্যায়: কবিতায় মিথ ও আর্কেটাইপের ব্যবহার

আদি-মানবের বলিষ্ঠ প্রত্যয় মথিত কাব্যকলার পথিকৃৎ মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় চেতন-অবচেতন, জৈব্-অজৈব, জীব-জড়, জৈবিক চেতনা সবকিছুতেই যেন গৃহ এবং গৃহগত বাঁধাধরা জীবনের ছক থেকে বিপরীত এক আস্ত কালখন্ড নির্মাণ করেন। যে জীবন গার্হস্থ আশ্রমিক খুঁটিতে বাধা গতানুগতিকভাবে একই ঢালে বয়ে যাওয়ার নয়, যে জীবনে আছে আদি উৎস শক্তি অর্থাৎ গাছপালা, নদী-সমুদ্রের শক্তিবীজ। গভীর, আসঙ্গ লিপ্সা। এইরকম সর্ববিধ উপাদান তিনি দেহ-মনে বহন করতে করতে সৃষ্টিক্ষম কবিতার জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি দেখতে পান আঁতুড় ঘর, গোরস্থান, তিনি দেখতে পান নির্জন বাড়ি, স্তব্ধ-নিস্তব্ধ, যুদ্ধ ও স্তব্ধতার মধ্যে এক নির্মিত-পুনর্নির্মিত জীবন।

কবি গাছপালা, পশুপাখি, নদী পুকুর এসব পরিবেশে ছেলেবেলার দীর্ঘ সময় অবাধ স্বাধীনতায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতিমেদুর পরিবেশ তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি প্রত্যেক কবির বিষয় হয়ে ওঠে, কখনো কবি প্রকৃতি প্রেমিক কখনো প্রকৃতিমগ্ন। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত কিন্তু সেই প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হননি, তার সঙ্গে খেলা করেছেন, গড়েছেন নিজেকে। প্রকৃতি তাঁর কাছে একটা স্বতন্ত্র ধারার চরিত্র। যেমন--

'বাঁশের ঝাড়ের নিচে খসে পড়া বাঁশের বাকল/শুয়ে থাকে নিরিবিলি'।[১] 'বাঁশের বাকল' এক মৃত সত্তা। ঋতু পরিবর্তনের খেয়ালে এভাবেই জীবনের পাতা ঝরার চিত্রনাট্য তৈরি হয়। আবার যখন তিনি বলেন--

'মাছরাঙা-চিল-বকের খাবার নিয়ে/ ছোট পুকুরটি যেন পাঁড়াগাঁর মেয়ে/ নীরবে বিছিয়ে আছে'।[২] তখন পুকুরের জীবন্ত সত্তা আমাদের অন্য এক বোধের কাছে পৌঁছে দেয়। কখনো বলেন- 'আকাশ পৃথিবী জুড়ে এই গুপ্ত ফুর্তি তুমি কিছুই দেখলে না'।[৩] তখন সমস্ত প্রকৃতি যেন কবিতায় চরিত্র হয়ে ওঠে। অবহেলায় যেমন সাধারণ বার্ধক্যজীর্ণ জীবন পড়ে থাকে একলা, এখানেও কবির লালিত সেই বন্য জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা যায় প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনকে কবি একাত্ম করেছেন।

বস্তুত সমস্ত প্রাণ অপ্রাণ জগতের সারাংশ নিয়ে এক রহস্যপথের উপর অতি ধীরে তাঁর চলাচল। জীবনের প্রতি ভালোবাসা, জীবনের প্রতিটি আয়োজনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ দিয়ে না জানলে চারপাশের টুকরো ছবি, চেনা পট, কাদামাখা মুখচিত্র, লোককথা, মিথ এবং আপাততুচ্ছ বিষয়সমূহের ভিতর প্রাণের সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করা যায় না। গ্রাম আর প্রকৃতি জীবনের অপূর্ব সহবাস তিনি দেখেছেন, কথা বলেছেন, প্রতিটি অণু পরমাণুর সঙ্গে। ফেলে আসা ঝিঁ ঝিঁ পোকা, জল ফড়িং, জারুল গাছের সাথে একাত্ম হয়ে থাকত তাঁর আত্মিক অনুভূতি। এই গভীর সংবেদনশীলতাই তাঁকে নিসর্গ ও বস্তুজগতের সুখ-দুঃখের অংশীদার করেছে। প্রকৃত অর্থেই তিনি হয়ে উঠেছেন 'শরৎমেঘ ও কাশফুলের বন্ধু'। , মিথে, আর্কেটাইপে সমাচ্ছন্ন জীবনেরই ইঙ্গিত দেয়, যে ইঙ্গিত পঞ্চাশের বাংলা কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা একমাত্র বহন করে।

তথ্যসূত্র:

১. মণীন্দ্র গুপ্ত ‘কবিতাসংগ্রহ’, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬, পৃ. ২৫

২. তদেব, পৃ. ২৮

৩. তদেব, পৃ. ৩৮

উপসংহার:

কবি জীবনের পরিধি ১৯৪৮ থেকে ২০১৮। অভিজ্ঞতার আকরে তাঁর কবিতা প্রথাগত বিষয় ছেড়ে এক অন্য ভালোবাসা ভালো লাগা এক অপরূপত্বের মোড়কে প্রকাশিত বাংলা কবিতার আকাশে। এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন কবি জহর সেনমজুমদার। তাঁর কবিতা মন্থন করে তিনি বুঝেছেন :

> তাঁর কবিতা পড়লে বোঝা যায় তিনি জল, অগ্নি, গুহা, বন, সমুদ্র, নীলিমা, ফড়িঙ নিয়ে সম্পূর্ণতই এক আদিমানব; 'নীল পাথরের আকাশ' থেকে 'লাল স্কুলবাড়ি' কিংবা প্রথম পর্বের কবিতা গুলি পড়লেই এই আদি মানবের আদিম ও রক্তাক্ত উপস্থিতি স্পষ্ট সনাক্ত করা যায়; পরের দিকে, কিঞ্চিৎ দ্বিতীয় পর্ব থেকেই দেখা যায় – এই আদি মানব ক্রমশই যেন হয়ে উঠেছে এক চলমান ভ্রাম্যমাণ মানবাত্মা, যার ভেতর প্রতি মুহূর্তে জ্বলে উঠছে একধরনের মহাজাগতিক চৈতন্যজ্যোতি; জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, জৈবতা, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা-সবকিছুর মধ্যে আবর্তন করতে করতে এই ভ্রাম্যমাণ মানবাত্মা আসলে অন্তহীণ পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই নিজের পায়ের চলার পথ গড়ে তুলেছে; পায়ে চলার এই পথ একইসঙ্গে নাটকীয় ও তরঙ্গসংকুল; আর তার ভেতর থাকতে থাকতে মণীন্দ্র গুপ্ত যেন এ-ও বলে দিলেন – আদি মানব হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু এই মহাজাগতিক ভ্রাম্যমাণ মানবাত্মা ? সে থেকেই যাবে, তার শেষ নেই, তার ধ্বংস নেই...

শতবর্ষ অতিক্রান্ত, একরোখা, ব্যতিক্রমী এমন একজন বাঙালি কবি হলেন মণীন্দ্র গুপ্ত। সৃষ্টির বহুমুখী কর্মপরিধিকে স্পর্শ করলেও কবিসত্তা আর ব্যক্তিসত্তা একাত্ম হয়ে থেকেছে। চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্নে যে দৃষ্টি একদিন বিভোর ছিল চিত্ররূপ কবিতার আকারে তা আমাদের বিহ্বল করে রাখে আজও। তাই বাংলা কাব্যসাহিত্যে কবি মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর উজ্জ্বলতায় ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হয়ে উঠবে বক্ষমান গবেষণায়। এ রকম ভাবে তাঁর কবিতার ভিতরে প্রবেশ করে তাঁর জীবনের কবিতা ও কবিতার জীবন বুঝে নেওয়ার সংকল্প স্বরূপ এই গবেষণাপত্র নির্মাণের আন্তরিক অভিলাষ।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. জীবনানন্দ দাশ, ‘কবিতার কথা’, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৭

২. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘কবিতাসংগ্রহ’, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, আদম, ২০১৬

৩. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘গদ্যসংগ্রহ ১’, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৮

৪. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘গদ্যসংগ্রহ ২’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৬

৫. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘অক্ষয় মালবেরি’, সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৯

৬. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘উপন্যাস সংগ্রহ’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৮

৭. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘রং কাকর রামকিঙ্কর’, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, অবভাস, ২০১৯

৮. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘দ্রাক্ষাপুঞ্জ, শুঁড়ি ও মাতাল’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, অবভাস, ২০১০

সহায়ক গ্রন্থ

১. অশোক কুমার মিশ্র, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দেজ, ২০০২

২. জহর সেন মজুমদার, ‘বাংলা কবিতাঃ মেজাজ ও মনোবীজ’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯৮

৩. শিশির কুমার দাশ, ‘গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব’, প্রথম সং, কলকাতা, দে’জ, ১৩৯২

৪. সুধীর চক্রবর্তী, ‘কবিতার খোঁজে’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পত্রলেখা, ২০১২

সহায়ক পত্রিকা

১. এইসময়, রবিবারোয়ারি, ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

২. গৌতম মন্ডল (সম্পা.), ‘আদম’, মার্চ ২০১৮

৩. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.), ‘পরিকথা’, সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৪

৪. প্রকাশ দাস (সম্পা.), ‘স্বকাল’, ‘কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সংখ্যা’, ফেব্রুয়ারী ২০১৮

৫. সংবাদ প্রতিদিন, ‘মণীন্দ্র গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা’, ৫ আগস্ট ২০১৮